The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp. 95 - 108)
Published in October, 2023

পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯০৫-১৯৫৫): একটি পর্যালোচনা

ড. রওশন আরা আফরোজ*

প্রতিপাদ্যসার

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠে। বিশ শতকের শুরুতে পূর্ববাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য নতুন সুযোগ এনে দেয়। উল্লেখ্য যে, এই প্রদেশে মুসলমানগণ ছিল সংখ্যায় বেশি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে তারা বিভিন্ন সরকারি উচ্চপদ লাভ করতে থাকে। পাশাপাশি শিক্ষিত মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শহর-নগরে ক্রমশ তাদের বসতি বৃদ্ধি পায়। গ্রামকেন্দ্রিক জীবন যেমন গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব রেখে থাকে তেমনি শহর ও নগরকেন্দ্রিক জীবনও আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে নাগরিক জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ ও এ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে মুসলিম সমাজের আগ্রহের ফলে শহর-নগরে তাদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কারণ, শহর-নগরই ছিল উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে গ্রামের অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ তাদের সন্তানদের শহরে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রেরণ করে। নতুন প্রদেশের শহর-নগরগুলো শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মুসলিম সমাজের জন্য জীবিকার নতুন দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তাছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নতুন শিল্প-কলকারখানা নির্মাণ, বিনোদনের নানা ব্যবস্থা, নাগরিক সুবিধা (বিদ্যুৎ, সুপেয় পানি, ড্রেনেজ ব্যবস্থা) গ্রামের মানুষকে নগরের দিকে টানতে থাকে। নগর ও নাগরিক জীবন নিয়ে ইতিপূর্বে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা হলেও পূর্ববাংলার মুসলিম সমাজের নগর জীবনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে পৃথকভাবে গবেষণার অপেক্ষা রাখে। প্রবন্ধে মুসলিম সমাজের নগর জীবন, নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মুসলিম সমাজের উপর কতটা প্রভাব ফেলে সে বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। উপাদান হিসেবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ ও বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের সাহায্যে নাগরিক জীবন ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এক

উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠে এবং বিশ শতকের প্রথমভাগ থেকেই শহর-নগরে মুসলমান চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র সংখ্যা বাড়তে থাকে। সেসময় স্কুল কলেজে ছাত্রদের পর্যাপ্ত আবাসিক সুবিধা না থাকায় তাদেরকে লজিং বা জায়গীর থাকতে হয়। তখন মুসলিম সমাজের যারা পরিবার নিয়ে শহরে পূর্ব থেকেই বাস করতেন তাঁরা জায়গীর রাখতেন। এর দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। এক, লজিং-এ থাকা ছাত্রটির মাধ্যমে নিজ সন্তানের লেখাপড়া করানো এবং দুই, সে সময়ের সামাজিক নিয়মানুযায়ী প্রেসটিজ রক্ষা করা (করিম ২০১৪, ৫৭)। এভাবে গ্রামের ছাত্র শহরে জায়গীর জুটিয়ে সেই বাড়িতেই গৃহশিক্ষক হিসেবে থাকাটা ছিল সাধারণ ব্যাপার। সেসময় সরকারি বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বেতন দিতে হতো না। তাই বৃত্তির টাকা থেকেই তাদের বই-পুস্তক, পেন্সিল ও খাতা পত্রের খরচ চলে যেত (হোসেন ১৯৮৬, ২৬৪-২৬৫)। হাবিবুর রহমান ১৯৩০ সালে রাজশাহী শহরে দশম শ্রেণিতে পড়তেন জায়গীর থেকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> গ্রাম হইতে যেসব মুসলমান ছেলে রাজশাহীতে স্কুল কলেজে পড়িতে আসে তাহারা বেশির ভাগই গরীব এবং হোস্টেলে থাকিয়া পড়াশুনা করার আর্থিক সামর্থ্য তাহাদের অনেকেরই থাকিত না। এই ছেলেরা জায়গীর থাকিয়া পড়াশুনা করিত। জায়গীরদাররা সাধারণত রাজশাহী শহরের এবং শহরতলীর গরীব বাসিন্দা এবং বস্তির বাসিন্দাই বলা চলে। গরীব হইলেও তাহারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার দিকে নজর রাখিত। বিশেষ করিয়া মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে সবিশেষ নজর রাখিত এবং গৃহশিক্ষক হিসেবে স্কুল কলেজের ছেলেদের জায়গীর রাখিত (৪৮)।

এভাবে জায়গীর বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা চালানোর চেষ্টা চলত। কারণ, গ্রামে ইংরেজি স্কুল বেশি ছিল না। তাছাড়া শহরে থেকে ইংরেজি স্কুলে পড়ার সামর্থ গ্রামের সকল ছাত্রের ছিল না। তাই এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিক পাশ করাটাই ছিল অধিকাংশ মুসলিম ছাত্রের লক্ষ্য। সকলের পক্ষে ঐ সীমা পর্যন্ত পৌঁছানোও সম্ভব হতো না। ম্যাট্রিক পাশ করা তরুণেরা কেরানির চাকুরির জন্য চলে যেত কলকাতায়। আগেই যাদের পড়াশোনা বন্ধ হতো তারা অনেকেই সাগর পাড়ি দিয়ে রেঙ্গুন(মিয়ানমার) চলে যেত, কলকাতায়ও যেত অনেকে। তারা কলকাতা-রেঙ্গুনের ইউরোপীয় সাহেবদের বয়, বাবুর্চি, মশালচি, খানসামা এবং বড় বড় হোটেলের ওয়েটার, বাটলার প্রভৃতি কাজ করত, কেউ কেউ সাহেব লোকদের ড্রাইভার হতো (শামসুদ্দীন, ২০০৫ : ৬৫)। অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে পাটের দাম বৃদ্ধি পায়। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে অনেক মুসলমান ছাত্রও স্কুল-কলেজের জায়গীর থাকার পরিবর্তে হোস্টেলে থেকে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মস্মৃতিতে বলেন,

> ১৯১৯ সালে আই. এ. পাশ করিয়া আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হই। বিশ্বযুদ্ধের দরুন পাটের দাম কিছুটা বাড়িয়া যাওয়ায় সব পাট চাষীর মতোই আমার বাপের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। এই সুযোগে আমি এস. এম. হোস্টেলে উঠি (১২১-১২৪)।

পূর্ব বাংলার প্রধান শহর ঢাকা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এটি প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হলেও বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ছিল শান্তি প্রিয়। চাকরি করে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনবার আশা তারা সকলেই পোষণ করত। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের ভেতর ধীরে ধীরে স্বাধিকার স্পৃহা জেগে উঠে। এ অবস্থা নাগরিক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসে (ইব্রাহিম ২০০৩, ৪৩০)। দেশভাগের পর ঢাকা শহরে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় ছিল; অনেক শিক্ষক ঢাকা ত্যাগ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাব দেখা দেয়ায় কর্তৃপক্ষ অনেক যোগ্য মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ দেন। মুহম্মদ আব্দুল হাই কর্তৃপক্ষের উৎসাহে ১৯৪৯ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন (মনসুর মুসা ১৯৮৮, ২০)। পূর্ব বাংলা থেকে আই. এ. পাশ করে অনেকেই যেত কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানীর জন্য তৈরি ভবনগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়। ঐ ভবনগুলোর কয়েকটি পূর্ববাংলা সরকারের কর্মকর্তাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। দেশভাগের পর সরকারি কর্মচারীদের অপশনের সুযোগ দেওয়া হয়, অর্থাৎ তারা পাকিস্তানে চাকরি করবে, নাকি ভারতে। সেই হিসেবে মুসলিম কর্মচারীদের প্রায় সকলে পাকিস্তানে চলে আসে। কলকাতার এবং পশ্চিম বাংলায় কর্মরত চাকুরিজীবীরা তাঁদের পরিবার পরিজনসহ ঢাকায় আসতে থাকে। তাই সরকারি অফিস পরিচালনার জন্য এবং সরকারি চাকুরিজীবীদের আবাসন সমস্যা দেখা দেয়। সরকারি চাকুরিজীবী ছাড়াও পশ্চিম বাংলার অনেক মুসলমানও পরিবার নিয়ে পূর্ব বাংলায় পাড়ি দেয়। বাংলার বাইরের অন্যান্য এলাকার অবাঙালি এবং উর্দু ভাষাভাষী মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় প্রবেশ করে। তারা ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে সুযোগ-সুবিধামত আশ্রয় নেয়। তখন শিল্প ও কলকারখানা তেমন ছিল না, সুতরাং তারা শহরে-বন্দরে ব্যবসার আড়ত বা ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত হতে থাকে। পরে শিল্প ও কলকারখানা (যেমন: আদমজী, বাওয়ানী, কর্ণফুলী কাগজের মিল ইত্যাদি) স্থাপিত হলে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। তবে তাদের একটা বড় আশ্রয়স্থল ছিল রেলওয়েতে। সেখানে প্রচুর বিহারি লোক নিয়োগ লাভ করে। এই কারণে রেলওয়ের বিভিন্ন স্থাপনা (যেমন: চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, ঈশ্বরদী ইত্যাদি) এলাকায় তারা দলে দলে যায় এবং কাজে যোগদান করে সেখানে তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় (আবদুল করিম ২০১৪, ১৬৭-১৬৮)। এছাড়া গ্রামের নিকটবর্তী নতুন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠায় কারখানায় চাকরি, কারখানা মালিকদের নিকট জমি বিক্রয় এবং শহরের অভিবাসীদের জন্য বাড়ি ভাড়া গ্রামের জন্য নতুন নতুন সুযোগ খুলে দেয়। এই সব উপায়ে অধিক উপার্জনের ফলে গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসে এবং গ্রামের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামোয় ব্যাপকভাবে পরিবর্তন ঘটে। বলা যায়, গ্রামের ব্যক্তিরা পুলিশ, আর্মি, বস্ত্র-কারখানায় চাকুরি পেতে থাকে। অল্প শিক্ষিত বা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন শহরে চাকরির সুযোগ পায় তখন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে-মেয়েদের তারা শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী হয় (Rao 1970, 45)।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল, কারণ মুসলমানেরা তাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার জেলাগুলোতে অবস্থানরত উচ্চশিক্ষা লাভে উৎসাহী ছাত্রদের পক্ষে কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করা কঠিন ছিল। ১৯০৫ সালে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ব বাংলায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয় এবং পূর্ব বাংলা যেহেতু মুসলিম প্রধান তাই এর সুফলভোগীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাই বেশি ছিল। এই সময়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলায় নানা অবকাঠামো সৃষ্টি হয়, স্কুল কলেজের সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, আবাসিক হোস্টেলের সংখ্যা, টেকনিক্যাল শিক্ষা সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায় (আবদুল করিম ২০১৪,

১৭৪)। শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ মুসলমানগণ নিজ সমাজের অগ্রগতির জন্য চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এই জন্য তাঁরা মুসলমান ছেলেদের শহরে থাকার এবং উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টায় লিপ্ত হন। খান বাহাদুর আবদুল আযীয চট্টগ্রাম বিভাগে সহকারী বিভাগীয় ইন্সপেক্টর থাকাকালে মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে সেখানে 'ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেল' নামে একটি বিরাট দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির কার্যক্রম ছিল গরীব মুসলিম মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়তা করা এবং ইসলামিয়া হোস্টেলকে মুসলিম ছাত্রদের হোস্টেল রূপে গড়ে তোলেন (আবদুর রহমান ১৯৭২, ১৬-১৭)। এ কাজের পুরস্কারস্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে খান বাহাদুর উপাধি দেন। পরবর্তিতে এর প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাওয়ায় আশির দশকে ভিক্টোরিয়া ইসলামিয়া হোস্টেল ভেঙে ফেলা হয় (শামসুল হক ২০০৭, ১১৭)।

দুই

শহরে বিভিন্ন আধুনিক সুযোগের বন্দোবস্ত থাকায় বিভিন্ন রকম লোকের সমাবেশ ঘটে। যাদের মধ্যে ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-ভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধির আদান-প্রদান হয়। ফলে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কেন্দ্র হয়ে উঠে শহর। ভূমিহীন এবং উদ্বৃত্ত মজুরেরা নতুন শিল্প এলাকায় ভিড় করে। গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকরা শুধু কলকারখানায় নয়, নতুন শহরগুলোতে বিভিন্ন কাজের সুযোগ পায়। শহর-নগরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, সমবায় ভিত্তিক লেনদেন এবং ধর্মঘট করার অধিকার নব্য শহরবাসীর সামনে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে অদক্ষ লোকও শহর এলাকায় কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। শহরাঞ্চলের উপার্জিত অর্থ গ্রামে তাদের পরিবারের নিকট পাঠানোর ফলে গ্রামীণ সমাজেও উদ্ভব হয় একটি নতুন মানের জীবনযাত্রা। কলকারখানার আয় জমির চেয়ে অনেকটাই নিশ্চিত হওয়ায় অনেকেই তাদের পরিবার নিয়ে শহরে চলে যায়। ফলে শহর ও শিল্প এলাকাগুলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে। নতুন নতুন রাস্তা তৈরি, পুরাতন রাস্তা মেরামত ও প্রশস্তকরণের ফলে প্রত্যেক জেলা সদরের সাথে রাজধানীর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় এবং পূর্ব বাংলার নগরগুলোতে অধিক ঘরবাড়ি তৈরি হয়। বন্দরগুলোতেও উত্তরোত্তর উন্নতি ও কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় (আবুল মনসুর আহ্‌মদ ২০১৪, ১৩৯-১৪০)। মফস্বল শহরগুলোতেও সুদৃশ্য দালান ও পরিষ্কার পীচের রাস্তা দেখা যায় (আবু রুশ্‌দ্ ১৯৯৮, ২৪)। তবে সেসময় গ্রাম থেকে শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল ছিল না। শামসুল হক ১৯৪১ সালে রংপুর থেকে ভোলা আসার বর্ণনায় বলেন, রংপুর থেকে ট্রেনে শিয়ালদা স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনে কুষ্টিয়া (নদীয়া জেলা) ও যশোহর জেলা পেরিয়ে খুলনায়, সেখান থেকে স্টীমারে করে চাঁদপুর নৌবন্দর হয়ে ভোলা যান। যোগাযোগ ব্যবস্থার এ অবস্থার জন্য এক প্রদেশের মধ্যেও মনে হতো নির্বাসনে যাওয়া (শামসুল হক ২০০৭, ৬৮)। এ বি এম হোসেন কুমিল্লা শহরের সাথে তাঁদের বাড়ির যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ করে বলেন,

> বাড়ি থেকে জেলা শহরের দূরত্ব ১৫ মাইলের মত হলেও রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অসুবিধায় তা অনেক বেশি বলে মনে হতো। বড় চাচা ও আব্বা জুরী বোর্ডের সদস্য হওয়ায় দেখেছি শেষ রাতে তারা কুমিল্লার পথে বাড়ি থেকে হেঁটে বা নৌকায় রওয়ানা হতেন, ফিরতেন গভীর রাতে (৭১)।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের সাথে বিশেষ করে রেল যোগাযোগের স্টেশন বা জংশন রয়েছে যেসব শহরে, সেগুলোর সাথে কলকাতার খুব ভাল সংযোগ ছিল। দার্জিলিং মেল পাড়ি দিত কুষ্টিয়া শহর হয়ে, কিংবা রংপুর হয়ে রেল চলে যেত আসাম। তখন অবহেলিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হতো পদ্মাপাড়ের পূর্বদিক বা মূল পূর্ব বাংলা। ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের জেলা শহরগুলোর যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, উপায়ও

ছিল দুর্বল। দেশভাগের ফলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগসূত্র হয়ে পড়ল বিচ্ছিন্ন ও অবহেলিত (মফিদুল হক ২০১২, ৫৯)। গ্রাম থেকে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ হলেও শহর-নগরের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ভাল ছিল। তবে তা পশ্চিম বাংলার শহরগুলোর তুলনায় ভাল ছিল না। ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই যখন কলকাতার শহরের রাস্তায় ট্রাক, বাস, মোটর গাড়ি ও মানুষ টানা রিক্শা চলত তখন ঢাকায় গরু ও ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া কিছু মোটর গাড়ি চলাচল করত (শাহানার হোসেন ২০১৮, ৯২)। এই ছিল মফস্বল বা গ্রাম থেকে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা। গ্রাম থেকে শহরের চাকুরিজীবীদের এভাবেই নিত্য প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা পাড়ি দিতে হতো।

বিশ শতক থেকে পূর্ব বাংলার শহরগুলো আধুনিক নগর উপাদানে সমৃদ্ধ হতে থাকে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যেই পূর্ব বাংলার বেশ কিছু শহর-নগরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানির কল চালু হয়। ঢাকায় পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা চালু হয় ১৯২৩ সালে। লেট্রিন তখনও এ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়নি। উনিশ শতকের মধ্যভাগ (১৮৫৬) পর্যন্ত লন্ডন শহরেও কলেরাসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল। সেখানে এ ব্যবস্থা তৈরি হয় ১৮৫৬ সালে। এরও প্রায় পৌণে একশত বছর পরে পূর্ববাংলার প্রধান শহর ঢাকায় এ ব্যবস্থা চালু হয় (মোহাম্মদ শাহ আলম ২০১৮, ৮৪)। অন্যান্য ছোট শহরের কথা সহজেই অনুমেয়। ঢাকা শহরে ১৮৭৭ সালে কেরোসিন বাতির প্রচলন হলেও ১৯০১ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রথম বিদ্যুৎ চালু হয়। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিদ্যুতের জন্য কোন ট্যাক্স নেয়া হতো না। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ আলোর জন্য বার্ষিক ৩ টাকা ও কেরোসিন বাতির জন্য শতকরা ১ টাকা নাগরিক কর ধার্য করা হয়। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর ঢাকার রমনা এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়। ১৯৪৬-৪৭ সালে ঢাকা শহরে ১,৩৭০টি বিদ্যুৎ বাতি ও ১,০৭০টি কেরোসিন ল্যাম্প ছিল (*ঢাকা প্রকাশ* ১৯১৩, ৩)। এ সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার অনেক শহরেই বিদ্যুৎ সংযোগ চালু হয়। ১৯৪৩ সালে জাতীয় অধ্যাপক ডা: নুরুল ইসলাম তাঁর দেখা প্রথম চট্টগ্রাম শহরের বর্ণনায় বলেন,

> চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে যখন পৌঁছি তখন সন্ধ্যা সাতটা। প্রথমেই চোখে পড়ল চারিদিকে বিজলীবাতি। অন্ধকার রাতের যেন অস্তিত্ব নেই। এত দিনের কল্পনার শহর আর গ্রামের ব্যবধান এখানেই, আলো আর অন্ধকার। শহরে তখন যানবাহন বলতে একমাত্র ঘোড়ার গাড়ি ছিল। রিক্শা আর বাস কিছুই ছিল না (৩১)।

১৯৪৭-এর দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন শহরে এ ধরনের নাগরিক সুবিধা বেড়ে যায়। এ সময়ের খুলনা শহরের বর্ণনায় আনিসুজ্জামান বলেন,

> খুলনা শহর তখন ছবির মত ঝকঝকে তকতকে। তিন-চারটি প্রধান রাস্তা তেমন চওড়া নয়, তবে মসৃণ পিচ দিয়ে ঢাকা আর খুব পরিচ্ছন্ন। তার উপর দিয়ে অত্যন্ত সস্তা ভাড়ায় সাইকেল-রিক্সা চলে।----- রাস্তায় বিদ্যুতের বাতি আছে- গ্যাসের আলোয়। কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ তেমন সম্প্রসারিত নয়। নানা জায়গায় পানির কল বসানো আছে (১১৫)।

তিন

শহরের বিনোদন ব্যবস্থাও ছিল আকর্ষণীয়। ১৯১১ সালের আগে বঙ্গদেশে ফুটবলের প্রবর্তন হয়েছে। কিন্তু ক্রীড়াজগতে বাঙালিরা সত্যিকারের মর্যাদা পায় ১৯১১ সালে। ১৯১১-১৯৩৪ এই পঁচিশ বৎসরে কলকাতা ও মফস্বল শহরে কয়েকটি প্রথম শ্রেণির খেলোয়াড় দল গড়ে উঠে। এ সময়ের কয়েকটি উঁচুমানের ক্লাবের মধ্যে ছিল ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল, ন্যাশনাল হাইয়ার স্পোর্টিং, মোহামেডান স্পোর্টিং, মোহনবাগান ও এরিয়ান্স উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে ফোর্ট উইলিয়াম আর্সেনাল ও মোহামেডান স্পোর্টিং ছিল মুসলমান

খেলোয়াড়দের দল (*আল্-এস্লাম* ১৩২৭, ৬২)। অভিজাত পরিবারের লোকজন এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এছাড়া পূর্ববাংলার অনেক শহরে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু। কিন্তু এসব শহরে মুসলমান শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির উপস্থিতিও ছিল। ১৯৩১ সালে খুলনা শহরের কেরানির চাকুরি করা কালে আবু জাফর শামসুদ্দীন খুলনা শহরের বর্ণনায় বলেন, খুলনা ছোট শহর, তখন বোধ করি লোকসংখ্যা পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের বেশি নয়। তিনি আরো বলেন,

> পূর্ববাংলা আইন পরিষদের স্পিকার আবদুল হাকিম তখন খুলনার উদীয়মান আইনজীবী। যশোর রোডের উপর ছিল তার দোতলা বাড়ি। তার শ্বশুরও ছিলেন খুলনা বারের খ্যাতনামা উকিল। ওঁরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। হাকিম সাহেবের অন্য প্রতিবেশী ছিলেন পরবর্তীকালে রাজনীতিক এবং তখন খুলনার বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় আবদুস সবুর খানদের পরিবার। এই ৩টি পরিবার ছিল তৎকালীন খুলনা শহরের এলিট (১২৭)।

এখনকার মত তখন টেলিভিশন ছিল না, রেডিও থাকলেও তা ছিল জনসাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তাই শহরে সিনেমা হলগুলো ছিল সর্বসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম স্থান (শামসুল হক ২০০৭, ১০১)। যেখানে শহর-নগরের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের যাতায়াত ছিল। তবে অনেক উৎসাহী ব্যক্তিও এতে যোগ দিতেন। জসীম উদ্‌দীন তাঁর আর্থিক দীনতার মধ্যেও ফরিদপুর শহরে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা তাঁর *জীবন কথা* নামক আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

> পরলোকগত কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদারের সময় হইতে আমাদের ফরিদপুর শহরে প্রতি বছর একটি কৃষি শিল্প প্রদর্শনী বসিত। এই উপলক্ষ্যে সেখানে নানা রকম গান-বাজনা হইত। একবার সেখানে বিল্ব-মঙ্গল অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। এই আমার প্রথম থিয়েটার দেখা (১৩৪)।

নগরে আধুনিক বিনোদনের ব্যবস্থা যে ছিল তা বলা যায়। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ঢাকা শহরে অবস্থাপন্ন বা স্বচ্ছল লোকেরা পরিবারসহ নাটক, সিনেমা, থিয়েটার দেখত। গুলশানের 'মাহবুব আলী ইনস্টিটিউট', বংশালের 'নিশাত', রায় বাজারের নিকট 'আযাদ' সিনেমা হলে ছিল এ ধরনের বিনোদন ব্যবস্থা (মোহাম্মদ শাহ আলম ২০১৮, ৮৫)। ঢাকার গুলিস্তান এলাকার আন্ডারপাসের উল্টো দিকে স্টেডিয়ামের কোণায় ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজের অফিস বিল্ডিংয়ে 'ব্রিটানিয়া' (Britinia) নামে একটি ছোট সিনেমা হল ছিল। এটি দেশভাগের আগে থেকেই ছিল (বদরুদ্দীন উমর ২০০৪, ২২৩)। এছাড়া সরকারি চাকুরিজীবীরা বিকালে ক্লাবে যেতেন, ক্লাবের লনে টেনিস খেলতেন (মিসবাহ উদ্দীন খান ২০০৯, ১৬)। তবে ভ্রমণে বা ছুটি কাটাতে অথবা অবকাশ যাপনের জন্য বর্তমানের মতো খুব একটা যেত না পূর্ববাংলার মানুষ। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন,

> ছুটিছাটা হলে বেড়াতে যাওয়া, এটা এখানে নেই। এখানে কোথায় যাবে মানুষ? কোন ব্যবস্থাও তো নেই। আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের কিছু জায়গা, কক্সবাজার অথবা সিলেটের চা বাগান। এসব জায়গায় তো গরীবদের কোন প্রশ্নই নেই। সাধারণ মধ্যবিত্তের জন্যও কোন ব্যবস্থা নেই। বড় লোক যারা তাদের জন্য সামান্য ব্যবস্থা আছে। মধ্যবিত্ত লোকজন যে বেড়াতে যেতে পারে সে ধারণাটাই এখানে দেখি না (৩০)।

চার

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে মুসলমানরা পূর্ব বাংলার নাগরিক সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও আধিপত্যকারী শ্রেণিতে পরিণত হয়। সে সময়ের বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক বা রেলকেন্দ্রিক শহরগুলো যে উন্নত নাগরিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মন্বন্তরের সময়ে কিছু অরাজকতা লক্ষ করা যায়। ৪৩ এর দুর্ভিক্ষের বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন,

> দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। গ্রাম থেকে লাখ লাখ লোক শহরের দিকে ছুটেছে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে। খাবার নাই, কাপড় নাই। ইংরেজ যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে। ধান, চাল সৈন্যদের খাওয়াবার জন্য গুদাম জব্দ করেছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ীরা গুদামজাত করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা দশ টাকা মনের চাউল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করেছে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় না (১৭)।

অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে শহরাঞ্চলের বিকাশ ঘটছে, অন্যদিকে গ্রামে বিচ্ছিন্নতার অবসান হয়েছে। একজন শহুরে চাকুরের নাগরিক জীবনে সুখ থাকলেও স্বচ্ছন্দ যে খুব একটা ছিল না তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। সা'দত আলি আখন্দ পুলিশের চাকুরি করা কালের ঘটনার বর্ণনায় বলেন,

> ছোট তিনটা ভাই স্কুলে পড়ে। আবার বিয়েও করে ফেলেছি চাকরির আগেই। মাস ঘুরলেই অনেকগুলো নগদ টাকার দরকার। অনেকগুলো চোখ আমার মাইনে পাওয়ার পয়লা তারিখের ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে থাকে যে (৩৫৭)।

উনিশ শতকের শেষ ভাগ হতেই মুসলিম সমাজ চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য পেশার সন্ধানে শহরে যেতে থাকে। নতুন প্রদেশ সৃষ্টির পর এ কাজটি আরও গতিশীল হয়। তবে ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানরা তখনও খুব একটা আগ্রহী ছিল না। এ প্রসঙ্গে *ছোলতান* পত্রিকায় বলা হয়,

> চট্টগ্রাম ও ঢাকা জেলার মোছলমানদিগকে বাদ দিলে সমস্ত বাঙ্গালার মোছলমান সমাজই ব্যবসা বাণিজ্যে উদাসীন। মাড়োয়ারীরা বিগত ৩০/৪০ বৎসরের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালা ও আসামে যে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব উন্নতি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় (২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)।

শহুরে-ভাব, সচেতনতা ও আধুনিক চিন্তার বিকাশ শহরের চাকুরিজীবী পরিবারে ছিল। গ্রামে সে অভ্যাস তখন ছিল না। আজও যে গ্রামে এ অভ্যাসটি খুব একটা তৈরি হয়েছে সম্পূর্ণভাবে তা বলা যায় না। এভাবে গ্রাম থেকে শহরে আসা মানুষগুলো এসেই শহরের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। তখন চেনা গ্রামও তার কাছে অচেনা আর নিরানন্দময় মনে হয়। ডা: আবদুল বাসেত বলেন,

> বরিশাল, ঢাকা এবং কলিকাতা দেখিয়া আসিয়া, আমার চক্ষু খুলিল। একের পর এক পরিবর্তন দেখিতে লাগিলাম। শহরগুলো দেখিয়া যখন গ্রামে আসিলাম মনে হইল পূর্বের মত আর মনে আনন্দ পাই না কেন? তাহা নিজেও বুঝিতে পারিলাম না। যে দিকে তাকাই সে দিকেই কেমন যেন একটা অভাবের ভাব। আমরা কোথায় আর এরা কোথায় (৩৬)।

শহর ও গ্রামের পরিবেশগত পার্থক্য ছিল লক্ষণীয়। আবদুর রহমান শহর-নগরে আভিজাত্যের উল্লেখ করে বলেন, "সিলেটের বহু লোক জাহাজের খালাসী, সুকানী ও মিস্ত্রীর কাজ নিয়ে বিদেশ যেত, অনেকে বিলাত

যেত। যা চট্টগ্রামেও লক্ষণীয় ছিল। তবে এখানকার অনেকে বার্মা যেত। চট্টগ্রামের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য ছিল- সেখানেও শহরে ও গ্রামে লম্বা-নলযুক্ত ফরসী-হুঁকো এবং কাঠ বা কঞ্চির নলওয়ালা পিতলের বা মাটির হুঁকোর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। শহরের প্রত্যেকটা ভদ্র পরিবারের বৈঠকখানায় ফরসী হুঁকো দেখা যেত (৩৮৫)। গ্রামের সাথে শহরের খাদ্যাভাসেও ছিল অনেক পার্থক্য। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সকালে পান্তা-মরিচ-লবন বা বাসি তরকারি খেয়ে থাকে। পিঠা-পুলি গ্রামে ঘরে-ঘরে তৈরি হলেও শহরে এগুলো দুর্লভ। এ প্রসঙ্গে শামসুল হক ঢাকায় প্রথম এসে যে খাদ্যাভাস দেখেন সেটি সম্পর্কে বলেন, 'দুপুরের আহারে গোস্তের সাথে ছিল নানা শাক সবজি, ছোট ছোট মাছ' (৫৫)। শহরের সকলের যে সমান অবস্থা ছিল তা নয়। আস্‌হাব উদ্দীন আহমদ বলেন, "আমাদের যা বাইরের ঠাঁট তার থেকে কার ভেতরের আসল অবস্থা যে কি, তা কি বোঝার যো আছে? ঘরে চাল না থাকতে পারে কিন্তু হালচালের মধ্যে নিত্য নতুন চালের অভাব তো নেই' (১৩)। ড. মোহাম্মদ শাহ আলম ঢাকা শহরে আসার পরের বর্ণনায় বলেন,

> এখন যে নূতন মজায় মজে গেছি- রাস্তায় হাবিবের মুদির দোকানের মুরালি, এক পয়সার চেপটা সন্দেশ, এক পয়সার ডিমের বাতাসা বা মেরিং (Meringue)। আইসক্রিম ওয়ালার এক পয়সা দুপয়সার বিভিন্ন রং এর আইসক্রিম, কুলফি মালাই। হাওয়াই মিঠাই ওয়ালার বারান্দায় বসে বানিয়ে দেয়া লাল গোল তুলার মত মিঠাই। উড়িষ্যার টিকিওয়ালা লোকটির মোটা লাঠিতে পেঁচানো গোলাপী মিঠাই যা বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে বানিয়ে দেয়া হতো। ফেরিওয়ালার ঝালমুড়ি, চানাচুর, বাকরখানি, বিভিন্ন রকমের আচার, কটকটি মিঠাই। রাস্তার পাশে মাখনা, পানি ফল, তালের কচি বিঁচি, তালের রসের জেলি। আরও কতকিছু যা গ্রামে দেখিনি (৭৩)।

গ্রামের মানুষ শহরে পেশাজীবী হওয়ার পর অনেকেই শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তা সত্ত্বেও গ্রামের সাথে তাদের থাকত গভীর যোগাযোগ। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পর পূর্ববাংলায় হিন্দুরা ছিল সংখ্যালঘু, যারা দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত ছিল প্রভাবশালী স্বচ্ছল সংখ্যালঘু। উঁচু শ্রেণির যারা এদেশে থাকাটা বেছে নিলেন তাদের কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মফস্বল কলেজের অধ্যক্ষও ছিলেন। ঢাকায় এসময় হিন্দুদের বাড়িগুলোই আগত সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য দখল করা হতো। সেগুলোই ছিল সবচেয়ে বড় ও সুবিধা সমন্বিত বাড়ি। আর সেগুলোর মালিকদের তা রক্ষা বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তখন ছিল না (স্টক ২০১১, ৮৯)। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আক্রান্ত জেলাগুলোর কিছু বাড়ি সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ফেরদাউস খান বলেছেন,

> আমাদের পাঠানটুলীর পৈত্রিক দ্বিতল বাড়ীটি সরকার রিকুইজিশন করে নিয়েছিলেন সেনা অফিসারদের সাময়িক বসবাসের জন্য। চট্টগ্রামের সাথে রেঙ্গুন ও আকিয়াবের যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন পূর্ববাংলার চাকুরিজীবী ও বণিকগণ সেখান থেকে নিজ এলাকায় চলে আসেন (৫৩)।

পাঁচ

ইংরেজদের নিকট এদেশের মুসলিম রাজক্ষমতা হারাতে বাধ্য হলে শুরু হয় ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির যুগ (গোপাল হালদার ২০১৩, ১৬)। ব্রিটিশ শাসনের দু'টি উপাদান সামাজিক পট পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। প্রথমত, পশ্চিমা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (কলকারখানা) এবং দ্বিতীয়ত, সরকারের সামাজিক (শিক্ষা ব্যবস্থা) পরিকল্পনা। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, ক্ষুদ্র পরিবার গড়ে উঠেছে, নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যা আমাদের সামগ্রিক সামাজিক জীবনে প্রভাব ফেলেছে

(Afsaruddin 1983, 16)। সেসময় শহরের সরকারি পদগুলি সম্মানিত পরিবারের সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। সমাজে শিল্পায়ন ও নগরায়ন যতই ঘটছে ততই একক পরিবারগুলো যৌথ পরিবারের স্থান দখল করে নিচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খুব দ্রুতই দেশের লোকেরা শহরমুখী হয়ে পড়ছে। দেশভাগের ফলে পূর্ব বাংলার শহরগুলোতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। নতুন প্রদেশ গঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের ফলে মুসলিম সমাজের পোশাক-পরিচ্ছদেও পরিবর্তন আসে। গ্রামে ধীরে হলেও শহর-নগরে এ পরিবর্তনটি দ্রুতই ঘটতে থাকে। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই লুঙ্গী পরতো। মুসলমানরা পরতো একরঙ্গা লুঙ্গি, হিন্দুরা পরতো চেককাটা লুঙ্গি। বড় শহরে চাকরিজীবীরা প্যান্ট ও শার্ট পড়লেও মফস্বল শহরে হিন্দু-মুসলিম সবাই সাদা শার্ট ও ধুতি পড়তেন (আনিসুজ্জামান ২০১৫, ৭০-৭২)। ১৯৩৮ সালে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় বর্ণনাতে মিসবাহউদ্দিন খান বলেছেন,

> বরিশাল খুব পরিচ্ছন্ন ছিমছাম শহর ছিল। ঘন হিন্দু বসতিপূর্ণ শহর জীবনে ছিল কংগ্রেস আধিপত্য। আমরা ছাড়া সবাই কি হিন্দু কি মুসলমান ধুতি পড়তেন। আমরা হাফপ্যান্ট বা পায়জামা শার্ট পড়তাম। শীতের দিনে শার্টের উপর কোট পড়তাম। হিন্দু ছেলেরা আমাদের পায়জামা পরিহিত দেখলে বলত- দোনালা পরে এসেছে (২০)।

এভাবে মুসলমান সমাজ আলাদা পোশাক পরলে তখন হিন্দু সমাজ উপহাস করে কথা বলত। স্কুলের পোশাক (১৯৪৪) সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর বলেন, 'আমরা তখনকার দিনে স্কুলে যেতাম হাফ পায়জামা ও শার্ট পরে' (৩২)। পোশাক সম্পর্কে *ছোলতান* পত্রিকায় বলা হয়,

> নব্য শিক্ষিতগণ টুপির জানি দুশমন হইয়া পড়িয়াছে। যে পূর্ববঙ্গে জাতীয় পোশাক, বিশেষতঃ টুপির একসময় অত্যন্ত প্রচলন ছিল, সেই পূর্ববঙ্গেও আজকাল নব্য দলের মধ্যে অমোছলমানী পোশাক পরিচ্ছদের পূর্ণ প্রভাব দৃষ্ট হইতেছে। আচকান, পায়জামা, লুঙ্গি, তহবান ও টুপির পরিবর্তে সর্বত্র ধুতির প্রচলন হইয়াছে। আর টুপির দুর্ভাগ্যের এ কথাই নাই। টুপির সহিত নব্য মোছলমানের যেন ঘোর শত্রুতা সাধিত হইয়াছে (৪ এপ্রিল, ১৯২৪)।

এতে নগর সংস্কৃতির রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়, পাকিস্তান আন্দোলন অধিকতর জোরদার হওয়ার পর পাঞ্জাবি-পাজামা পরার রেওয়াজ অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ এলাকার মুসলমানদের মধ্যে ধুতির ব্যবহার একেবারে উঠে যায়। পাজামা-পাঞ্জাবি, শার্ট, লুঙ্গি হয় নিত্যদিনের পোশাক (শামসুল হক ২০০৭, ১৯)। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আত্মপরিচয় গোপনে উৎসুক হিন্দু-মুসলমান অধিকাংশ লোকই প্যান্ট-শার্ট এর ন্যায় পোশাকের আড়ালে সম্প্রদায়গত পরিচয় লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করত (মো: আবদুল মোহাইমেন ১৯৮৬, ৬৩)। ১৯৪৭-এর পরে অনেকে টাই, স্যুট পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেন। এ ধরনের পোশাক পরে তখন প্রফেসর ছাড়া আর কেউ সচরাচর যেত না। প্রায় সবাই ট্রাউজার, শার্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবি পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন (মিসবাহউদ্দিন খান ২০০৯, ৬৬)। সুফিয়া কামাল শহরের নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বলেন,

> কাপড়-চোপড়ে ঢাকাই শাড়ী থানের উপর চিকনের কাজ করা আবেরওযাঁ আর আসল মসলিন না হলেও নামে মসলিনের উপর চিকনের কাজ করানো কাপড়ের ব্যবহার ছিল। পুরুষদের কুরতা, বেনিয়ান, শেরওয়ানী তাই দিয়ে তৈরি হতো। বিয়ে-সাদীতে সাচ্চা কাজ করা সিল্কের কাপড়ে

> পেশোয়াজ, ওড়না, পাজামা এবং জোড়া বদলাইয়ের জন্য বেনারসী শাড়ীর প্রচলন ছিল। তারপর এল বোম্বাই শাড়ী (৫৬১)।

হাবিবুর রহমান শহরের স্কুলে ভর্তি হয়ে দেখলেন যে হিন্দু ছেলেরা ধোপার ধোয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধুতি চাদর জুতা মোজা পরিধান করত। কথাও বলত মার্জিত ভাষায়। অল্প সময়ের মধ্যে এই স্কুলের আদব কায়দা তিনিও রপ্ত করলেন। যে হিন্দু ছেলেরা তাকে টিটকারী করত তারাই তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে থাকে (২১-২২)। সে সময় অনেকের বাড়ি ছিল পূর্ববাংলায়, কিন্তু চাকুরি সূত্রে অন্যত্র (বেশির ভাগই পশ্চিম বাংলায়) থাকতেন (শাহানারা হোসেন ২০১৮, ৫২-৬১)। প্রয়োজনের জন্য বাস করলেও বৈবাহিক সম্পর্ক খুব একটা হতো না। সেকালে বড় পরিবার বিশেষ করে সৈয়দ পরিবারের বিয়ে সাদী নিজেদের পরিবারের মধ্যে হওয়াই প্রথা ছিল। এতে সম্পত্তিও বাইরে যেত না, আরও থাকত বংশগত সৌন্দর্য ও আদব কায়দা রক্ষার ব্যবস্থাও। শিক্ষা ও সামাজিক পরিবেশ আলাদা হলেও শহরের মুসলিম সমাজ থেকে কিছু গোঁড়ামী একেবারে ছিল না তা বলা যায় না। মিসবাহউদ্দিন খান তাঁর শিক্ষিত চাকুরিজীবী পিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি খুব শিক্ষিত পুত্রবধু চান না। অথচ তিনিই হলেন মেয়েদের উচ্চশিক্ষা দেয়ার পক্ষপাতী। বিশ শতকেও মনে করা হতো বেশি পড়ালেখা জানা মেয়ে অবাধ্য হয় (৭৩-৭৪)। মোট শিক্ষিতের মধ্যে সেসময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম। আর নারীরা ছিল আরো কম। তখনকার দিনে চৌদ্দ বছর বয়স হলেই মেয়েদের বিয়ে দেয়ার জন্য মা-বাবারা চিন্তিত হয়ে থাকতেন। সম্ভ্রান্ত কি সাধারণ পরিবার, সামাজিক অবস্থাটাই ছিল এ রকম। বিশ শতকের মধ্যভাগ জুড়েই দেখা যায় নারী শিক্ষায় অনেকেই এগিয়ে আসেন। স্কুল-কলেজে নারীর অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে বাড়লেও সামাজিক কিছু প্রচলিত নিয়ম রীতির উর্ধ্বে সমাজ যেতে পারেনি। প্রতিভাবান কোন নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও শিক্ষিত ও অভিজাত ঘরের মেয়েকেও অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি তারা বজায় রাখতেন। নবাব পরিবার, জমিদার পরিবার, কিছু সামাজিক প্রভাবশালী ব্যক্তি ও শিক্ষিত মুসলিম পরিবার থেকেই এ রকম কিছু প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নারীরা উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে (জওশন আরা রহমান ২০১০, ৪৪)।

তাছাড়া শহরে মুসলিম নারী সমাজের জন্য তখনও পর্দা রক্ষা করে চলার প্রথা ছিল। ডা: আবদুল বাসেত বলেন, "ঢাকার স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে ভীষণ পর্দা ছিল। ঘোড়ার গাড়ীতে পর্যন্ত পর্দা লাগাইয়া চলিত। মটর গাড়ীতেও পর্দা লাগাইতে দেখিয়াছি। বোরখা ছাড়া মেয়েরা কোথাও বাহির হইত না" (৪২)। গ্রামীণ সমাজে কিছু রীতি-নীতি ধর্মীয় জীবনের অংশ হলেও বিজ্ঞান প্রভাবিত শহরের জীবনে তা হয়ে পড়ে কুসংস্কার (আবুল মনসুর আহমদ ১৯৯৫, ১৪)। সে সময়ে শহরেও কিছু গ্রামীণ নিয়ম চালু ছিল। সন্তান জন্মাবার সময় গ্রাম ও শহরে আজকের দিনের মত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সচেতনতার বালাই ছিল না। এর বর্ণনায় বদরুদ্দীন উমর বলেন,

> আগেকার দিনে অনেক বাড়িতে আঁতুড় ঘর করত একটা অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। আমাদের আঁতুড় ঘর ছিল অন্য রকম। আমাদের পরিবারের মেয়েরা সন্তান জন্মের আগে সবাই বর্ধমানের বাড়িতে

আসতেন। আজকালকের মত তখন হাসপাতালের ব্যবস্থা ছিল না। মনে হয় সেজন্যই ছিল এই ব্যবস্থা (১৩)।

এ প্রসঙ্গে *বিচিত্রা* পত্রিকায় বলা হয়, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া মহকুমা শহরে একটি দাতব্য নারী চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ময়মনসিংহ হতে গৌহাটি পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে প্রায় দুই শতাধিক মাইলের মধ্যে এটিই একমাত্র স্ত্রীলোকদের স্বতন্ত্র চিকিৎসালয়। সেখানকার সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত চন্দ্র দাস আই. সি. এস এর চেষ্টায় এটি স্থাপিত হয় (১৩৪৪, ৭০৬)। গ্রামের তুলনায় ভাল চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকায় শহর-নগর অনেকের প্রধান আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমদিকে বাংলায় মুসলিমদের সাংবাদিকতায় গোড়াপত্তন হয়। এরা পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং সভা-সমিতির মাধ্যমে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল বাংলার মুসলমানদের জন্য ধর্মগত ও সমাজগত দিক দিয়ে আত্মচেতনা ও নবজাগরণের আন্দোলন। যার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ থেকে অজ্ঞতা, অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি দূর হতে থাকে। আর ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এই শিক্ষিত শ্রেণি ক্রমেই রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে। উনিশ শতকের শেষদিকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে মোট দশটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসময় অধিকাংশ পত্রিকা পরিচালিত হতো হিন্দু মালিকানায়। শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মুসলমান সমাজ ক্রমে শিক্ষিত হয়ে ধীরে ধীরে সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। ১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জাতীয় জাগরণ ও ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক তৎপরতার বছরগুলোতে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র শিল্প বিকাশের ভিত্তি প্রস্তুত হয়। এসময়ে বাংলা থেকে প্রকাশিত ১৭৩টি সংবাদপত্রের মধ্যে আনুমানিক ৬৫টি পূর্ববঙ্গ থেকে মুদ্রিত হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আট বছরে সংবাদপত্র ও সাময়িকীর সংখ্যা ২৫৯ থেকে ১৬০-এ হ্রাস পায় (*বাংলাপিডিয়া* ২০১১, ১৬৮)। এ সমস্ত পত্রিকার প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সমাজকর্মী, ধর্মীয় নেতা ও জমিদার শ্রেণি। এদের মধ্যে করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, দেলদুয়ারের করিমুন্নেছা চৌধুরাণী, আবদুল হালিম গজনবী, ধনবাড়ির সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, পশ্চিমগাঁওয়ের নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, ঢাকার নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ বাহাদুর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ২০০১, ১০)। *বাসনা* নামক পত্রিকাটি শেখ ফজলুল করিম কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রত্যন্ত রংপুর জেলার কাকিনা 'শাহাবিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস' থেকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটি ১৩১৫ সালের বৈশাখ মাসে (১৯০৮খ্রি.) প্রথম প্রকাশিত হয়। *বাসনা* পত্রিকায় মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পর্কে সাহিত্যিকদের ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে (কাজী আবদুল মান্নান ১৯৯০, ৩৭৭)। ১৯৪৭ সালে কলকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের সম্পর্ক যেমন ছিল সহজ তেমনি ছিল ঘনিষ্ঠ। দেশভাগের পর নতুন প্রদেশ (পাকিস্তানের) পূর্ব বাংলার সঙ্গে কলকাতার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণে ছিন্ন হয়ে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজকর্মের মত প্রকাশনা শিল্পেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এর কারণ এ অঞ্চলের মানুষের বই মুদ্রণের অভিজ্ঞতা, মেশিনপত্র, প্রয়োজনীয় হরফের অভাবসহ প্রেস চালাবার মত আর্থিক সঙ্গতিও খুব একটা ছিল না। তখন মফস্বল শহরগুলো স্বল্প পুঁজি ও

ছোট খাট প্রিন্টিং মেশিনে মুদ্রণ কাজ চালাত (শামসুল হক ২০০৭, ৫০)। অবশ্য ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্রসংগঠনগুলো নানা রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাচ্ছিল। তখন পূর্ববাংলার প্রেস ব্যবসা তুঙ্গে উঠে। শহরের মুদ্রণ শিল্পে যা ছাপা হতো তা বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রেরিত হতো। এ সম্পর্কে মো: আবদুল মোহাইমেন *দুই দশকের স্মৃতি*-তে উল্লেখ করেছেন,

> ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অসাম্য, অবিচার মানুষকে ক্ষুব্ধ করে তুললে আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকা ও কাগজপত্র ছাপার ব্যাপারে আমাদের প্রেস একটা কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায় (৭)।

উপরিউক্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে বলা যায় যে, সামাজিকতা পল্লী জীবনের বৈশিষ্ট্য। এদিক থেকে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গ্রাম। শহরে সামাজিক জীবনের অভাব থাকায় নিবিড় প্রতিবেশিত্ব গড়ে উঠে না। এছাড়া শহর-নগর শিল্প-কারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্র পরিচালনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় এখানকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়ে উঠার সময় থাকে না। যেটুকু গড়ে উঠে তা হলো বিভিন্ন সভা-সমিতি ও সংগঠনে যোগদান করার মাধ্যমে। যা মূলত প্রতিবেশিত্বমূলক বৈশিষ্ট্যের অংশ নয়। তাই শহর ও গ্রামের চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র এক হতে পারে না। গ্রামে বর্তমানে বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত ও আধুনিক আবাসন ব্যবস্থাসহ অনেক আধুনিক উপকরণ আছে যা তখন ছিল না। তাই শহরে জীবন যাপন করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। এগুলো ছাড়াও উচ্চ শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের জীবিকার নিমিত্তে নগরজীবন আজও মানুষের প্রধান আকর্ষণ। গ্রামে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির চর্চা ও এর প্রকাশ ঘটে। কিন্তু শহরে একটি শিক্ষিত পেশাজীবী অভিজাত এলাকায় বিভিন্ন জেলার মানুষেরা বাস করে। এখানে সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয়। এক নতুন উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠে। উৎসব, বিনোদন, পোশাক, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রেই নাগরিক জীবনে উন্নত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সূত্র নির্দেশ

আনিসুজ্জামান, *কাল নিরবধি*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৫।

আবদুর রহমান, *যতটুকু মনে পড়ে*, প্রথম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, রহমান সন্স পাবলিকেশন্স, ১৯৭২।

আবদুল করিম, *সমাজ ও জীবন*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, হাসি প্রকাশনী, ২০১৪।

আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, অখণ্ড সংস্করণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

আবু রুশ্‌দ্, *আত্মজীবনী: জীবন ক্রমশ-ঠিকানা পশ্চিম-এখন বর্তমান (১৯১৯-১৯৮৮)*, ঢাকা-চট্টগ্রাম, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৫।

আবুল মনসুর আহমদ, *আত্মকথা*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৪।

আস্‌হাব উদ্দীন আহমদ, *আমার সাহিত্য জীবন*, ঢাকা, ১৯৮০।

এ বি এম হোসেন, *পড়ন্ত বেলার গল্প*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৫।

কাজী আবদুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-রাজশাহী-যশোর-রংপুর : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ১৯৯০।

কাজী মোতাহার হোসেন, 'কুষ্টিয়ার স্মৃতিকথা', আবদুল হক সম্পাদিত, *কাজী মোতাহার হোসেন রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৮৬।

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ, *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৪।

গোপাল হালদার, *বাঙালি সংস্কৃতির রূপ (১৯৪৪-১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩৫১-১৩৫৩ বঙ্গাব্দ)*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, মুক্তধারা, ২০১৩।

জওশন আরা রহমান, *স্মৃতিকথা একটি অজানা মেয়ে*, তৃতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, নবযুগ প্রকাশনী, ২০১০।

জসীম উদ্‌দীন, *জীবন কথা*, প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, পলাশ প্রকাশনী, ১৯৬৪।

ড. মোহাম্মদ শাহ আলম, *আমার আংশিক আত্মজীবনী*, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮।

ডা: আবদুল বাসেত, *হৃদয় আমার কাঁদেরে*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৭৬।

ডা: নুরুল ইসলাম, *জীবনস্রোতে*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, আনোয়ারা-নূর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ১৯৯১।

নীলিমা ইব্রাহিম, 'বিন্দু বিসর্গ', রফিকুল ইসলাম, সেলিনা হোসেন, রহীম খান, বিশ্বজিৎ ঘোষ, মঞ্জুরা কবীর সম্পাদিত, *নীলিমা ইব্রাহিম স্মারকগ্রন্থ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, নীলিমা ইব্রাহিম বালাদেশ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ২০০৩।

বদরুদ্দীন উমর, *আমার জীবন*, ১ম খণ্ড (১৯৩১-১৯৫০), ঢাকা, সাহিত্যিকা, ২০০৪।

মনসুর মুসা (সম্পাদিত), *মুহম্মদ আব্দুল হাই- জীবনী গ্রন্থমালা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, অমর একুশে বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮।

মফিদুল হক, *দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতা এবং সম্প্রীতির সাধনা*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২।

মিসবাহউদ্দিন খান, *আত্মস্মৃতি*, বাংলাদেশ চর্চা-১৭, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০৯।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)*, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০১।

মো: আবদুল মোহাইমেন, *দুই দশকের স্মৃতি*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৬।

মোহাম্মদ ফেরদাউস খান, *জীবনের ঘাটে ঘাটে*, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, আহ্‌ছানিয়া বুকস, ২০০২।

শামসুল হক, *একান্ত কথা*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, গ্রীণ পাবলিশার্স, ২০০৭।

শাহানারা হোসেন, *বেলা শেষের পাঁচালি*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০১৮।

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৫।

সা'দত আলি আখন্দ, 'অন্য জীবন', মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদিত, *সা'দত আলি আখন্দ রচনাবলী*। প্রথম প্রকাশ, ঢাকা,বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

সুফিয়া কামাল, *একালে আমাদের কাল* (আত্মজীবনী), সাজেদ কামাল সম্পাদিত, *সুফিয়া কামাল রচনা সমগ্র*। প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০২।

স্টক, এ. জি. (মোবাশ্বেরা খানম অনুদিত), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি (১৯৪৭-১৯৫১)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, সুবর্ণ প্রকাশন, ২০১১।

হাবিবুর রহমান, *আমার জীবন*, প্রথম প্রকাশ, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫।

আল্-এস্‌লাম, ১ম সংখ্যা, ৬ষ্ঠ ভাগ, বৈশাখ, ১৩২৭।

ছোলতান, ৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০; ৮ম বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা, ২২ চৈত্র, ১৩৩০, ৪ এপ্রিল ১৯২৪।

ঢাকা প্রকাশ, ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩।

বাংলাপিডিয়া খ-১৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১।

বিচিত্রা, একাদশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।

Mohammad Afsaruddin. 'Some aspects of social change in Bangladesh in the post-liberation period', *Bangladesh Journal of Sociology*. Vol. I, No. I, 1983.

Rao, M. S. A. *Urbanization and Social Changes: A Study Of A Rural Community On A Metropolitan Fringe*. New Delhi, Orient Longmans Ltd., 1970.